উন্নয়নের জন্য যে মূল্যবোধ প্রয়োজন, কাজের প্রতি যে আনুগত্যবোধ, যে শৃঙ্খলাবোধ এবং যে নিয়মানুবর্তিতা থাকা প্রয়োজন সেগুলির অভাব নবাগত দেশগুলিতে লক্ষ করা যায়। এছাড়া জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস এবং নানা ধরনের কুসংস্কার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, উন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নবাগত দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই দেশগুলির মাথাপিছু আয় না বাড়া সত্ত্বেও এই দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়তে শুরু করেছে। উন্নত দেশগুলিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ অনুভব করতে হয়নি কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নবাগত দেশগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু হওয়ার আগেই এইসব দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার ফলে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধি যতটা বাধার সৃষ্টি করেছিল, বর্তমানের অনুন্নত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নবাগত দেশগুলির ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাধা তার থেকেও বেশি।

চতুর্থত, কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও নবাগত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে খুব বেশি অনুকূল নয়। অধিকাংশ নবাগত দেশই কোন না কোন উন্নত দেশের উপনিবেশ ছিল। এখন এই দেশগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যখন নবাগত দেশগুলি উন্নত দেশের উপনিবেশ ছিল, যখন রাজনৈতিক দিক থেকে নবাগত দেশগুলি স্বাধীনতা অর্জন করেনি, তখন উন্নত দেশগুলি থেকে বৈদেশিক মূলধন সহজেই নবাগত দেশগুলিতে এসেছিল। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নবাগত দেশগুলি রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বেসরকারি বৈদেশিক মূলধন এই দেশগুলিতে খুব বেশি নিযুক্ত হয় না। সদ্য স্বাধীন এই নবাগত দেশগুলি বিদেশি মূলধনকে সন্দেহের চোখে দেখে। অনেক দেশেই বিদেশি মূলধনের আমদানির উপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। অনেক দেশে আবার বিদেশি মূলধনের মালিকানায় গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করা হয়েছে। ফলে উন্নত দেশগুলি থেকে বেসরকারি মূলধনের নবাগত দেশগুলিতে বিনিয়োগ করতে খুব বেশি আগ্রহ লক্ষ করা যায় না। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নবাগত দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এই সাহায্য দেওয়ার সময় নানাবিধ শর্ত আরোপ করে। অনেক সময়েই এই শর্তগুলি নবাগত দেশগুলির স্বার্থের পরিপন্থী হয়। সেজন্য নবাগত দেশগুলি এই ধরনের আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য গ্রহণ করেও খুব বেশি লাভবান হ'তে পারে না।

1.11. স্বল্পোন্নত দেশের তিনটি মৌলিক সমস্যা (Three Key Issues of Less Developed Countries) :

অধ্যাপক গিলের মতে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে **তিনটি মৌলিক সমস্যা** দেখা দেয়। সেই তিনটি মৌলিক সমস্যা হল যথাক্রমে ঃ

1. বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করার সমস্যা,
2. কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সুষম উন্নয়ন বজায় রাখার সমস্যা এবং
3. জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের সমস্যা।

এই তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা একে একে আলোচনা করব।

1. বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করার সমস্যা ঃ

আমরা জানি যে অনুন্নত দেশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মূলধনের অভাব। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে মূলধন গঠন বা বিনিয়োগ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, বিনিয়োগের হার কী কী উপায়ে বৃদ্ধি করা যেতে পারে ? **অধ্যাপক গিলের মতে, চার রকম উপায়ে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।** এই চার রকম পদ্ধতির প্রতিটির সুবিধা এবং অসুবিধা আমরা বর্ণনা করব।

প্রথমত, দেশে যদি কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রমিক থাকে সেই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে মূলধন গঠনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। অধ্যাপক নার্কস্ এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের প্রচ্ছন্ন বেকার বলেছেন। প্রচ্ছন্ন বেকারদের কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাস্তা তৈরি, বাঁধ তৈরি প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকরা কৃষিক্ষেত্রে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ভোগ করত সেই পরিমাণ খাদ্য দ্রব্যের যোগান যদি তাদের কাছে অব্যাহত রাখা যায় তাহলে এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের দিয়ে মূলধন গঠনের কাজ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হ'ল এই যে, এই পদ্ধতিতে স্বল্প ব্যয়ে মূলধন গঠন সম্ভব। এখানে সমাজের সকলের ভোগব্যয় একই থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বের যে সঞ্চয় সুপ্ত অবস্থায় ছিল সেই সঞ্চয়কে এখন ব্যবহার করে মূলধন গঠন করা সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতির কয়েকটি অসুবিধা আছে। **প্রথমত,** গ্রামীণ উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের এক জায়গায় জড়ো করে কাজে লাগানো খুবই কঠিন। তাছাড়া এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং সংগঠন প্রয়োজন। স্বল্পোন্নত দেশে এগুলির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** যদি এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিককে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে শিল্পে বা মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করা হয় তাহলে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত হারে হ্রাস পেতে পারে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে না যদি কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে অথবা কৃষিতে পুনর্গঠনমূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সেগুলি না করা হলে উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের মূলধন গঠনের কাজে নিয়োগ করা যায় না। **তৃতীয়ত,** কৃষিক্ষেত্র থেকে তারা যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য ভোগ করত সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছাবে না। কৃষিক্ষেত্র থেকে এই উদ্বৃত্তটা কর বসিয়ে অথবা লেভির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। এই উদ্বৃত্ত সংগ্রহের কাজটি সহজ হবে না।

মূলধন গঠনের **দ্বিতীয়** উপায় হল কর ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া। করের সাহায্যে সরকার বাধ্যতামূলকভাবে দেশের সঞ্চয়ের একাংশ নিজের হাতে তুলে নেয়। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ সরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়। অনেক সময়ে করলব্ধ অর্থ বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতেও তুলে দেওয়া যেতে পারে। অনুন্নত দেশে স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় কম থাকে বলে অস্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থার মাধ্যমে অস্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অবশ্য কর ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। কর ব্যবস্থার সুবিধা হল এই যে, কর বসানোর মাধ্যমে জনসাধারণকে দিয়ে জোর করে সঞ্চয় করানো যায়। তাছাড়া ধনীদের উপর উচ্চ হারে কর বসিয়ে তাদের বিলাসবহুল ভোগব্যয় কমানো যায়। কিন্তু কর ব্যবস্থার অসুবিধা হল যে করের হার বৃদ্ধি করলে উৎপাদকদের উৎপাদন করার ইচ্ছা হ্রাস পায়। আবার ক্রেতাদের ব্যয়যোগ্য আয় কমে গেলে তাদের কাজের ইচ্ছাও হ্রাস পায়। এছাড়া অনুন্নত দেশের মাথাপিছু আয় খুব কম থাকে। সেখানে আয়কর বসিয়ে খুব বেশি কর রাজস্ব আদায় করা যায় না। আবার ধনী সম্প্রদায়ের উপর কর বৃদ্ধি করলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয় কমিয়ে দিয়ে ভোগব্যয় একই রাখতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশে কৃষিক্ষেত্রটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কৃষকদের থেকে কর সংগ্রহ করা আরও কঠিন কারণ কৃষকদের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম। আবার অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণেও কৃষকদের উপর বেশি করভার চাপানো যায় না। যে দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা ধনিক শ্রেণির হাতে রয়েছে সেই দেশে ধনিক শ্রেণির উপর অধিক মাত্রায় কর ধার্য ক'রে কর রাজস্ব বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে মূলধন গঠন করা যেতে পারে। সরকার যদি বাজেটে ঘাটতি ব্যয় করে এবং যদি এই ঘাটতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ নিয়ে পূরণ করা হয় তাহলে এই ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করে। আবার, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যদি উৎপাদকদের বেশি অর্থ ঋণ দেয় তার মাধ্যমেও মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সরকারের হাতে অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের হাতে অধিক অর্থ গিয়ে পৌঁছায়। এই অর্থ সরকার অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তরা দ্রব্যসামগ্রী কিনতে ব্যয় করে। যে দ্রব্যসামগ্রী ভোগ্যদ্রব্য হিসাবে জনসাধারণ ভোগ করত সেই দ্রব্যসামগ্রী সরকার অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা

বেশি দাম দিয়ে কিনে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে। এর ফলে ভোগব্যয় হ্রাস পায় এবং বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল যে এটি প্রয়োগ করা সহজ এবং এটি বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাড়তে থাকলে বেসরকারি উদ্যোক্তারা অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হল এই যে একবার মুদ্রাস্ফীতি শুরু হলে তা দমন করা কঠিন। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় সেই মুদ্রাস্ফীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে দেখা গেছে যে মুদ্রাস্ফীতির হার অতি উচ্চস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে এবং এর ফলে দেশের অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দ্রুত হারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সেটি কখনই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সহায়ক হতে পারে না কারণ দ্রুত হারে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে দেশের অর্থে জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দেয়।

চতুর্থত, বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির অপর একটি উপায় হল বৈদেশিক মূলধন বা বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা। অনুন্নত দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কম মূলধন গঠন হয়ে থাকে। সেজন্য অনুন্নত দেশকে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করতে হতে পারে। বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব এবং এই বৈদেশিক মুদ্রার দ্বারা প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করে দেশের মূলধনের অভাব দূর করা সম্ভব। এছাড়া বিদেশ থেকে উন্নত প্রযুক্তি বা দক্ষ শ্রমিক, দক্ষ প্রশাসক প্রভৃতি আমদানি করার জন্যও বিদেশি মূলধন এবং বিদেশি সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু বৈদেশিক মূলধন এবং বৈদেশিক সাহায্যের অসুবিধাও আছে। বৈদেশিক মূলধনের অসুবিধা হল এই যে, এই মূলধন যে মুনাফা করবে সেই মুনাফা বিদেশে প্রেরিত হবে। ফলে অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের হার অপেক্ষাকৃত কম হবে। এছাড়া বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো হয় তাহলে ভবিষ্যতে সেই ঋণ শোধ দিতে হবে এবং সেই ঋণের উপর সুদ দিতে হবে। এর ফলে দেশের মূলধনের একটি অংশ দেশের বাইরে চলে যাবে। এছাড়া বৈদেশিক সাহায্যের সঙ্গে অনেক সময়েই নানাবিধ শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে। এই শর্তগুলি সাহায্য গ্রহণকারী দেশের মনঃপূত নাও হতে পারে।

2. কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে সুষম উন্নয়নের সমস্যা ঃ

স্বল্পোন্নত দেশে আর একটি মূল সমস্যা হল কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে একটি সমতা বজায় রাখা। অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান সমস্যা হল ঃ কৃষিক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ করা হবে, না শিল্পক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ করা হবে ? অন্যভাবে বলতে গেলে, কৃষি অথবা শিল্পের মধ্যে কোন্ ক্ষেত্রের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন ?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময়ে কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত না শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আবার কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট পথনির্দেশ পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লবের সময় কৃষি এবং শিল্প উভয়ই বিকাশ লাভ করেছিল। আমেরিকার ক্ষেত্রেও এই উক্তিটি প্রযোজ্য। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই উক্তিটির ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময়ে ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। এর ফলে ঐ দেশে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন অবহেলিত হয়েছে এবং সোভিয়েত দেশকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করে অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সোভিয়েত ইউনিয়নে সম্ভব হয়েছে।

যাঁরা শিল্পের উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁদের অভিমত হল এই যে, কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলে মোট

জাতীয় উৎপাদন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে পারবে। এছাড়া শিল্পক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম দ্রুত কার্যকরী হয় না। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের সময় নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ অর্জন করা যায়। এই সমস্ত কারণের জন্য শিল্পক্ষেত্রেই অধিক বিনিয়োগ করা উচিত।

কিন্তু যাঁরা কৃষিক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ করার পক্ষপাতী তাঁদের বক্তব্য হল এই যে, অনুন্নত দেশে মূলধনের পরিমাণ কম। এই স্বল্প পরিমাণ মূলধন কৃষিতে সহজেই নিয়োগ করা সম্ভব। শিল্পে নিয়োগ করার জন্য অধিক মূলধন প্রয়োজন। সেই অধিক মূলধন সংগ্রহ করার আগেই কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাছাড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্যও কৃষির উন্নয়ন কিছুটা প্রয়োজন। তার কারণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য কৃষিক্ষেত্র থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হবে। আবার শিল্পজাত দ্রব্য কৃষিক্ষেত্রে বিক্রি করার জন্যও কৃষকদের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন। সেজন্য কৃষিজাত দ্রব্যের, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের, অভাব দেখা দেবে ; খাদ্যদ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পাবে। খাদ্যদ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পেলে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিক মজুরি দিতে হবে। এর ফলে শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা হ্রাস পাবে। শিল্পক্ষেত্রের মুনাফা পুনরায় বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো হয়ে থাকে। মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে শিল্পক্ষেত্রে কম মুনাফা হবে। সুতরাং মূলধন গঠনের হারটি শিথিল হয়ে পড়বে।

আসলে কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যে একটি সমতা থাকা প্রয়োজন। কৃষির উন্নয়নের জন্য যেমন শিল্পের উন্নয়ন প্রয়োজন তেমনি শিল্পের উন্নয়নের জন্যও কৃষির উন্নয়ন প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সার, কীটনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রয়োজন। এগুলি যোগান দেওয়ার জন্য দেশে শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটা প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, শিল্পক্ষেত্রের বিকাশ ঘটার জন্য কাঁচামাল, শিল্প শ্রমিকদের ভোগের জন্য খাদ্যশস্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। এগুলির জন্যও কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ ঘটা দরকার।

কৃষি বনাম শিল্পের এই বিতর্ক আসলে অপর একটি বিতর্কের অংশমাত্র। সেই বিতর্কটি হল ঃ একটি অনুন্নত দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় কোন্ ধরনের কৌশল গ্রহণ করবে ? দু'ধরনের উন্নয়ন কৌশলের কথা বলা হয়। একটি হল সুষম উন্নয়ন কৌশল (Balanced growth strategy) এবং অপরটি হল অসম উন্নয়ন কৌশল (Unbalanced growth strategy)। সুষম উন্নয়ন কৌশলের মূল বক্তব্য হ'ল এই যে, দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপভাবে বিনিয়োগ করা দরকার যেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি সমতা বজায় থাকে। অন্যদিকে অসম উন্নয়ন কৌশলের মূল বক্তব্য হ'ল এই যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগ এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যেন কতকগুলি ক্ষেত্র দ্রুতহারে বিকাশ লাভ করে। স্বভাবতই সুষম উন্নয়ন কৌশলের প্রবক্তারা কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে একটি সমতা বজায় রাখার পক্ষপাতী। অন্যদিকে অসম উন্নয়ন কৌশলের প্রবক্তারা শিল্পক্ষেত্রে অধিক জোর দেওয়ার পক্ষপাতী। উন্নয়ন কৌশল সম্পর্কিত এই বিতর্ক নিয়ে আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

3. জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের সমস্যা ঃ

অধ্যাপক গিলের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের তৃতীয় মৌলিক সমস্যা হল জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত জনসংখ্যা নীতির সমস্যাটি। জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যাটিকে দু'ভাবে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নির্দিষ্ট এবং প্রদত্ত বলে ধরে নিয়ে এর ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমরা এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারি। অনেক সময়ে দেখা যায় যে ধর্মীয় কারণে বা মতাদর্শের খাতিরে বা অন্য কোন সামাজিক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। জনসংখ্যা একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ধরে নিয়ে কীভাবে সেই জনসংখ্যাকে কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমানো সম্ভব না হয় তাহলে অনুন্নত অর্থনীতির প্রধান সমস্যা হ'ল কীভাবে জনসংখ্যাকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এর সঙ্গে কৃৎকৌশল নির্বাচনের সমস্যাটি জড়িত।

যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমানো না যায় তাহলে দেশের উচিত হবে এরূপ উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা যে উৎপাদন পদ্ধতি হ'ল শ্রম-নিবিড় বা শ্রম-প্রগাঢ় (Labour-intensive)। শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এইভাবে স্বল্পোন্নত দেশের বেকার সমস্যাকে দূর করা সম্ভব হবে।

এক্ষেত্রে অবশ্য একটি সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যাটি হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রসার—এই দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের। যদি শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহলে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় ঠিকই, কিন্তু তাতে মজুরি বেশি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের মুনাফা কম হয়। যেহেতু মজুরির বেশির ভাগ অংশই ভোগব্যয়ে ব্যয়িত হয় কাজেই দেশের সঞ্চয় এবং মূলধন গঠন কম হয়। অন্যদিকে যদি মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় তাহলে দেশের মুনাফা বেশি হয় এবং সেই মুনাফাকে পুনরায় উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে দ্রুত হারে মূলধন গঠন সম্ভব হয়। তবে যে দেশে বেকার সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং স্বল্পকালে বেকার সমস্যা কিছুটা প্রশমিত করা একান্ত প্রয়োজন সেখানে স্বল্পকালে শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার দ্বিতীয় দিকটি হ'ল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করা। এর জন্য পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পরিবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো জন্মহারকে কমিয়ে ফেলা। তবে এই পথেও নানান বাধা লক্ষ করা যায়। জনসাধারণের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা এবং ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার জন্য পরিবার পরিকল্পনার কার্যসূচি যথেষ্ট সফল হয় না। তাছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই ফল পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফল পেতে কিছু দেরি হয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, দেশে যত শিল্প বিস্তার হয়, দেশে যত শিক্ষার প্রসার ঘটে ততই জনসাধারণ স্বেচ্ছায় জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের জন্য বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তার দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শিক্ষার প্রসার ঘটলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হ্রাস পায়।